মৃ ত্যু দা তা

হরেকৃষ্ণ ডেকা

অনুবাদ : রবীন্দ্র সরকার

আমার ষাট বছরের জন্মদিনে ছেলেটির সাথে দেখা হয়েছিল। যেসব অনুরক্ত পাঠক আমার এই জন্মদিনটি হীরকজয়ন্তী হিসাবে পালন করেছিলো, তাদের ভিতর ছিলো না ছটফটে এই ছেলেটি। অনুষ্ঠানটা শেষ হতেই ছেলেটি এগিয়ে এলো। বলল, 'আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই'। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে থাকতে আমার ভাল লাগত আর তাই অনুরাগীদের আয়োজিত এই জয়ন্তী পরিতৃপ্তিতে মন ভরিয়ে তুলেছিল। কিন্তু ছেলেটির প্রথম প্রশ্নটিই ছিল অস্বাভাবিক আর আমি কিছুটা থতমত খেয়েছিলাম প্রশ্নটি শুনে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনার কি মৃত্যুভয় আছে?' প্রিয় এই দিনটিতে এরকম একটা অপ্রিয় প্রশ্ন! কিন্তু সুন্দর এই সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে চাইনি। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, নেই। মৃত্যুতে আমার ভয় নেই। এক দিনতো মরতেই হবে। উত্তরটা মিথ্যে ছিল। স্মিত হাসিতে উত্তরটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিলাম। আসলে ছেলেটির এই প্রশ্নের আগে আমি আমার মৃত্যুর কথা ভাবিইনি। তার মৃত্যুভয় শব্দটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমার মনটা সচেতন হয়ে উঠেছিল আর আমাকেও যে একদিন মরতে হবে একথা ভাবার সাথে সাথে আমার মনেও জেগে উঠেছিল মৃত্যুভয়। আমার এই জন্মদিনটাকে যে উৎসব হিসেবে পালন করা হলো, প্রকৃতপক্ষে তা হয়তো সৎকারেরই এক প্রাক অনুষ্ঠান— এরকম একটা ভাব খেলে গেল মনের কোণে আর আমি অনুভব করলাম যে আমার এক বৎসর আয়ু কমার জন্যই এই উৎসবের আয়োজন।

ছেলেটির দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল আরো অদ্ভুত। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মৃত্যুকে কি আপনি দৈবিক ঘটনা বলে ভাবেন?' প্রথমে আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারিনি। পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'মানে?' সে বলল, 'ধরুন, আপনি অসুখ হয়ে ভুল চিকিৎসায় মারা যেতে পারেন, পথে বেরিয়ে মোটর দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন অপটু গাড়িচালকের ভুলে অথবা ঘাতক আপনার প্রাণনাশ করতে পারে। কিন্তু তবুও আপনি কি ভাবেন যে মৃত্যু মানুষের হাতে নেই, ঈশ্বর যদি আপনাকে আয়ু দিয়েছেন আপনি বাঁচবেনই?' আমি প্রশ্নটাতে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। আমি ভাবি কারো আয়ুই কেউ কেড়ে নিতে পারে না। দৈব করণ স্থির করে না রাখলে কারো মরণ হয় না। আমি সেভাবেই উত্তরটা দিয়েছিলাম। ছেলেটি কিছু না বলে শুধু হেসেছিল। তার হাসির অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।

তার তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল, 'আপনি যে কাহিনিগুলো লেখেন, সেগুলো এক একটি মনোরম কাহিনি, সুখপাঠ্য। আপনি যে একজন জনপ্রিয় লেখক তা আপনার অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়। আজকের এই উৎসবমুখর সভাতেই শুভাকাঙ্ক্ষী এত অনুরাগী পাঠক জড় হয়েছে। আমার প্রশ্নটা হলো, 'আপনি আপনার পাঠকে খুশি করতে তাদের কল্পনার খেয়ালে রুচিকর খোরাক দেবার জন্য লেখেন, না চারপাশের ঘটনাবহুল জগতের তাৎপর্য খোঁজেন আর বাস্তবের সাথে তার সংযোগ কোথায় তা খোঁজার জন্য লেখেন?' প্রশ্নটা আমার ভাল লাগেনি। আমি পাঠকের বাহবা আশা করি। সুতরাং অধিকাংশ পাঠক যা পছন্দ করে তাই আমি লিখব, অন্যরকম কেন লিখব? পাঠকের ভাল লাগা লেখা না লিখে এতটা জনপ্রিয় হলাম কীভাবে? সেখানে বাস্তব, তাৎপর্য... ইত্যাদি কথাগুলোর কী দরকার? আমি বললাম, দেখ, আমার লেখা পড়ে পাঠকের যদি তৃপ্তি হয়, তাতেই আমার সার্থকতা। সেটাই আমার লেখার তাৎপর্য। পাঠকের রুচি আর পাঠকের খুশিই আমার লেখার ব্যারোমিটার। তারা মনোরম, মোলায়েম কাহিনি-ই পছন্দ করে আমি তাই দিই।

দেখছিলাম, ছেলেটি মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিল। আমার কথায় সম্মতি জানানোর জন্যই সে মাথা নাড়ছিল, না অন্য কোনো কারণ ছিল তা অবশ্য বুঝতে পারিনি।

আরো নানা ধরণের প্রশ্নই করেছিল। ছেলেটির একটা প্রশ্ন আমার কাছে ধাঁধার মতো লাগছিল। প্রশ্ন না বলে তাকে একটা উক্তি বলাই বোধহয় ভাল। সে বলেছিল, 'মানুষ দুবার মরে বলে আপনি কি বিশ্বাস করেন? একটা জৈবিক মৃত্যু। প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মৃত্যু হয় মানুষের। আর একটা সামাজিক মৃত্যুও আছে। এই ধরুন, একজন লেখকের জনপ্রিয়তা শেষ হয়ে গেল, তার লেখার পাঠক না হওয়াতেই সবাই তাকে ভুলে গেল। সেটা হলো তার সামাজিক মৃত্যু।' এই উক্তির পর সে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। তারপর জানতে চাইল, আপনি কি ভাবেন সে ধরণের মৃত্যু আছে?' এরকম একটা প্রশ্নে বিব্রত না হয়ে পারিনি। আমি আমকে ঘিরে থাকা অনুরক্ত ভক্তদের দিকে তাকালাম। এরা সবাই কি আমাকে ভুলে যেতে পারে? ভুলে গেলেই বা আমি মরব কেন? যখন যা পাওয়া দরকার সবই আমি পেয়েছি। বিশেষ ভাবে অর্থ আর যশ। আমার স্বাস্থ ভালো আছে আমি পরিপূর্ণ জীবনযাপন করব বলেই বিশ্বাস করি। একটা পরিতৃপ্ত সাফল্যের জীবনযাপন করার পর আমি মরব। সেই একটাই আমার মৃত্যু। তার আগে আমি মরব কেন? এই কথাগুলো আমি ছেলেটিকে বলেছিলাম। লক্ষ করছিলাম, মাথা নাড়াটা ছেলেটির স্বভাব। কিছুটা বিরক্তি জনক। কিন্তু মুখে কিন্তু মন্তব্য করলাম না।

এরপর সে শেষ প্রশ্নটি করে বিদায় নিয়েছিল। বলেছিল, 'দেখুন, আজ যারা এখানে ভাষণ দিল, সকলেই আপনাকে শতায়ু হওয়ার আশীর্বাদ দিয়েছে। আচ্ছা আপনি নিজে কত বছর বাঁচবেন বলে ভাবছেন?' আমি কোনো চিন্তা - ভাবনা না করেই বলে দিলাম, নব্বই বছর। বুঝেছ, নব্বই বছর। আমিও বুঝেছিলাম সে উত্তরটা হাস্যকর হয়েছিল। কেনই বা আমার মুখ ফসকে নব্বই বছর বেরিয়ে গেল? কিছুদিন আগে মৃত বলে ভুল ধারণা নিয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে নব্বই বছরেও সুস্থাস্থ্য নিয়ে পরিতৃপ্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছিলাম একটি অনুষ্ঠানে। হয়তো সেজন্যই নব্বই বছরটা আমার মুখে সহজেই এসে গেল। তাছাড়া আমার স্বাস্থ্যও ছিল ভাল। অসুখ - বিসুখেও ভুগি না। তদুপরি আমার লেখার এত অনুরাগী পাঠক, তারাও লেখক হিসেবে আমার ভিতরে এক ধরণের নিরাপত্তাবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। আকস্মিক মৃত্যুর ভাব মনে আসেনি।

সাক্ষাৎকারগুলোতে সাধারণত কি হয়, প্রশ্নকর্তা এক একটা প্রশ্ন করে আর আমিও মুখে যা আসে তাই উত্তর দিয়ে দিই। পরে সেই প্রশ্নটা আর তার উত্তরটার কথা ভেবেও দেখি না। অনুরক্ত পাঠকরা আমার উত্তরে চমৎকৃত হলেই আমার পরিতৃপ্তি। আমার লেখাকে যেমন পাঠকের রুচি আস্বাদ দিয়েছে, আমার নামটাও সেভাবে তাদের খুশির ভিতর দিয়ে চিরজীবি হয়েছে আর এর ভিতর দিয়েই লেখক হিসেবে আমার সম্পূর্ণতা - বোধ। বাকি যা তা উপরি পাওনা।

কিন্তু ছেলেটির প্রশ্নগুলো যে আত্মতৃপ্ত মনে কোথাও কয়েকটা খোঁচা দিয়ে গিয়েছিল। এই অদ্ভুত কয়েকটি প্রশ্ন আমার সুবিন্যস্ত মনে বেশ কয়েকটি জট পাকিয়ে রেখে গেল আর সাহিত্যের নামে আমার বোনা জালটা হচ্ছে একটা কল্পনার জাল। সেখানে বাস্তব জীবনের অনেক প্রশ্নই ধরা পড়ে না, কারণ বাস্তবের বিলে ফেলা হল না সেই জাল। অনুরাগী পাঠকের হাততালি সেখানে যতই উচ্চস্বরে শোনা যায়। ততই

অবাস্তব হয়ে যায় জাগরিত জীবন।

জট - পাকানো এই ভাব হয়তো মন থেকে মুছে যেত। কিন্তু সেদিনই আমাদের শহরের বড় বোমা বিস্ফোরণটি হলো। সংবাদপত্রে প্রকাশিত মানবদেহের ছিন্ন-ভিন্ন, বীভৎস রূপ - নেয়া ছবিটি দেখে শিউরে উঠলাম। আমার কাহিনিগুলোতে যে মনোরম জগত আমি সৃষ্টি করি, সেখানে সুন্দর চরিত্রগুলো সুন্দরভাবে কথা বলে, রাগ—অনুরাগ, আবেগ অনুভূতির নানা উপাদানে রচিত সে কাহিনিগুলো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, অজস্র অনুরাগী পাঠক সেখানে খুঁজে পায় আনন্দের খোরাক, আমি নিজেও যে জগতের বাসিন্দা, আজকের এই বীভৎস ঘটনা আমার এই মনোরম জগতকে যেন বিকৃত করে দিয়েছে। ঘটনাটি অলীক, না মনোরম কাহিনির জগতটা অলীক— কেন আমার এরকম একটা বিভ্রান্তি হচ্ছে? বিস্ফোরণ আগেও ঘটেছে, সেই নির্মম ঘটনার বিবরণও বেরিয়েছে কাগজে। কিন্তু আমার অনুরাগী পাঠকের হৃদয় - রঞ্জনের কাহিনি রচনায় মগ্ন থাকাকালীন এ ধরণের ঘটনায় কোনদিনই বিচলিত হইনি। আজ সবই আমার অনুরাগী পাঠকদের আয়োজিত হীরক জয়ন্তী উৎসবের সেই সপ্রতিভ ছেলেটির একটি প্রশ্নের আমার দেয়া উত্তর. সব কেমন জট পাকিয়ে দিল। আমি বলেছিলাম, মৃত্যু দৈবের হাতে। এই ছিন্ন-ভিন্ন দেহটিকে কি দৈব বিস্ফোরণের বলি করল?

আমার নব্বই বছর বয়স হয়েছে। আমি এখন বিছানায় লেপটে থাকার মতো পড়ে আছি আর মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছি। আসলে মৃত্যুকে আমি অধীর আগ্রহে আহ্বান জানাতে চাই। আমার স্মৃতিশক্তিও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। যারা আমাকে দেখতে আসে, কৌতূহল নিয়ে তাকায়, সেই মুখগুলো আমার অচেনা মনে হয়, পাকাচুল, ষাট বছর বয়সের একজন লোক এসে কখনো আমার পাশে বসে। নম্রভাবে আমাকে সম্বোধন করে, 'বাবা'। আমি লোকটির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকি, চিনতে পারি না। সে আমাকে প্রশ্ন করে, 'কেমন আছেন আপনি?' কেমন আছি কথাটার কোনো অর্থ নেই বলে মনে হয়। থাকা আর না থাকার মাঝে থেকেও আমার ভয় লাগছে না। না থাকাটাও নিতান্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে আমার আর একটা সম্পূর্ণ জীবন ভোগ করার পর এই বিলয়টুকুই বাকি বড় তৃপ্তি নিয়ে সেই ক্ষণটুকুর জন্যই যেন অপেক্ষা করছি। দৈব শব্দ টা মনে আসার সাথে সাথে আমার মনে পড়ল সপ্রতিভ সেই বুদ্ধিমান ছেলেটিকে আর তার সুন্দর মুখখানা। আমার ষাট বছরের জন্ম - জয়ন্তীতে তার করা প্রশ্নগুলো স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। আমার স্মৃতিশক্তি একটু একটু করে লোপ পাচ্ছে। আমাকে বাবা বলে সম্বোধন করে, পাশে বসে আমার হাত ধরে নানা রকম প্রশ্ন করা লোকটি আমার কে হয় আমি জানি না। স্মৃতিশক্তিকে ঝাঁকুনি দিয়েও অনুমান করতে পারি না। কিন্তু সেদিনের সেই ছেলেটির কথাগুলো আর তার সুন্দর মুখখানা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। বুদ্ধিমান ছিল ছেলেটি। তার জানতে চাওয়া আমার দেওয়া দুটো প্রশ্নের উত্তরে যে অমিল ছিল, সে কথা আমি এখন বুঝতে পারলাম। একটা প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম যে— দৈবই মানুষের মরণ স্থির করে। অথচ পরে আমি কত বছর বয়সে মরব, এরকম একটা প্রশ্নের উত্তর বলেছিলাম, নব্বই বছর বাঁচব। দৈবকে স্থির করতে না দিয়ে আমি নিজেই আমার পরমায়ু স্থির করে দিলাম। তার মুখে ফুটে ওঠা হাসির কথা মনে পড়ল। মৃত্যুর মুহূর্তে এই হাসির অর্থ আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু সত্য সত্যই আমি নব্বই বছর বয়সে মরতে বসেছি। আমার নিয়তি আমাকে এতটাই আয়ু দিয়েছে। ছেলেটি বেঁচে থাকলে বলতাম, দেখ, দৈব আমাকে যতটা বলেছিলাম ততটাই আয়ু দিয়েছে। আমি উদ্বেগহীনভাবে এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। কোঠাটিতে কৌতূহল নিয়ে আমাকে যারা দেখতে এসেছে, তারাও নিশ্চয় আমার মৃত্যুর মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করা বয়স্ক লোকটির সঙ্গে একজন মাঝবয়সি মহিলাকেও দেখি মাঝে মাঝে। একটি ফুটফুটে মেয়ে কৌতূহল নিয়ে প্রায়ই আমাকে দেখে যায়। মেয়েটি বয়স্ক সেই লোকটি আর মাঝবয়সি মহিলাটির নাতনি। একজন যুবতী মেয়ে কখনো এসে আমাকে ডাকে, 'দাদু'। সেই ফুটফুটে ছোট মেয়েটির মা। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা ভাবতে গেলেই সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। একটু আগেই ৮০- ৮১ বছরের এক বৃদ্ধা এসে আমার পাশে বসল। বড় কৌতূহল নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি বুঝতে পারছি না সে কী দেখছে। মাঝে মাঝে সে আগেও আসত আমার কোঠায়। আজ এসে বসার সাথে সাথে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাল আছেন তো? গুয়াহাটিতে কবে এলেন?' সৌজন্যের কারণেই জানতে চাইলাম। কথাটা অতি কষ্টে বললাম। একটু পরেই হয়তো কথা বলার শক্তি থাকবে না। গলার ভেতরে একটা ঘড়ঘড় শব্দ শুনছি। আমার প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধা সেই মহিলা যেন শিউরে উঠল। কোনো কথা না বলে এলোমেলো পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। বাইরে বেরিয়ে বয়স্ক লোকটিকে বলতে শুনলাম, 'তোর বাবাতো আমাকে চিনতেই পারছে না।' বয়স্ক লোকটি ভিতরে ঢুকে বলল, 'বাবা, মাকে চিনতে পারছ না? আমার সাথে এর সম্পর্কটা কি বুঝতে পারলাম না। এখন আর কোনো জটিল চিন্তা করব না এমনিতেই বললাম, 'ও'। আসলে মরার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি। আমার কোনো ধরনের উদ্বেগ নেই। যে লোকগুলো আমার কাছে আসে নানা সম্পর্ক ধরে ডাকে, তাদেরকে আমি চিনি না। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখতে পাই মানুষগুলোর। আমি যে মরব সেজন্য নয়। কারণ তারা জানে আমি মরবই। মরার পর আচার অনুষ্ঠানের জন্য কি কি জিনিস জোগাড় করতে হবে তা নিয়ে আলোচনার ফিস্‌ফাস্ কথা শুনছি। তাদের উদ্বেগ হয়তো কখন আমি মরব সেই সঠিক সময়টি না জানার জন্য। তাদের এক একজন এসে মাঝে মাঝে আমাকে পাহারা দেয়। আমি বলতে চাই, আমাকে পাহারা দেয়ার দরকার নেই। আমার ষাট বছরের জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে প্রশ্নকর্তা সেই ছেলেটির প্রশ্নের উত্তরে আমি ফাঁকি দিইনি, আমার মৃত্যুভয় নেই। এই কথাটা আমি বুঝতে পারছি। ছেলেটির মুখটা আবার মনে পড়ছে। তার সঙ্গে পরে আর সাক্ষাতের সুযোগই হলো না। কিন্তু সেই মুখ মনে এত স্পষ্টভাবে আঁকা হয়ে রইল কীভাবে! তা কি জীবনটাকে সহজ রোমাঞ্চকর কাহিনি হিসেবে নেয়া লেখক একজনকে অদ্ভুত কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্য? কিন্তু কোথায়, আমার কাছে প্রতিদিন আসা এই ঘরে থাকার লোকগুলোকে আমি চিনতে পারি না, এদের পরিচয় আমার মনে জট পাকিয়ে যায়। অথচ সেই ছেলেটির ছবি আমার তো স্পষ্ট মনে আছে। সে আমাকে আরো একটা প্রশ্নও করেছিল। মানুষ দুবার মরার কথা বলেছিল। একটা জৈবিক মৃত্যু অন্যটি সামাজিক মৃত্যু। আমার মতো একজন লেখক সমাজের স্মৃতি থেকে মুছে গেলে তা আমার সামাজিক মৃত্যু হবে কিনা জানতে চেয়েছিল সে। আমি কি বলিনি, মানুষ একবারই মরে। কিন্তু প্রশ্নটা আমার মনে একটা গোলমাল বাধিয়ে দিল। আমার জন্ম-জয়ন্তী পালন করার উদ্যোক্তা আর সভার শ্রোতাদের দিকে চেয়ে ভেবেছিলাম, এদের মনে সব সময়ই আমি বেঁচে থাকব। ভেবেছিলাম, জৈবিক মৃত্যু হলেও মানুষ এভাবেই কৃতিত্বের ভিতর দিয়ে অমর হতে পারে। তবুও মনে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। আমি কি ভাবিনি যদি আমার পাঠকরা আমাকে ভুলে যায়, তাহলে সামাজিকভাবে আমারওতো মৃত্যু হতে পারে। তাদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য কী ধরনের খোরাক দরকার তা জানি বলেই পাঠকের কাছে আমি জনপ্রিয় হয়েছি। যদি তাদের রুচি বদলে যায় তাহলে? মনে এসব প্রশ্ন আনতে না চাইলেও এ ধরণের ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। আমার পঁচাত্তরের মত বয়সে দেখছিলাম, নতুন লেখকরা আর আমার কাছে আসছে না। আমার লেখাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ কল্পনার উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল। একদিন দেখলাম, সংবাদপত্রে আমার নামের আগে 'প্রয়াত' শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। তার মানে সমাজের স্মৃতি থেকে আমি মুছে গেছি ইতিমধ্যেই। তবুও আমি উদ্বিগ্ন হইনি। প্রথম কথা লেখা - টেখার প্রতি কিছুটা উদাসীন হয়ে গিয়েছিলাম। তখন অমর হয়ে থাকার ইচ্ছেটাও যেন মরে যাচ্ছিল। এই ইচ্ছে না হওয়াটাও এক ধরণের

মৃত্যু নাকি? পরিপূর্ণ বয়সে আমার জৈবিক মৃত্যুটা হচ্ছে এই নব্বই বছর বয়সে যখন মৃত্যুর ক্ষণ শুনছি তখন তা বুঝতে পারছি নাকি?

অমি ছেলেটিকে বলেছিলাম, আমার মৃত্যুভয় নেই। এখনও ভাবি আমার মৃত্যুভয় নেই। কিন্তু আমার মনের গভীরে কখনো কি মৃত্যুভয় জন্মেছিল? সেদিন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ছিন্ন-ভিন্ন বীভৎস হয়ে যাওয়া মানব দেহটা দেখে কেন শিউরে উঠেছিলাম? শুধুই ঘটনার নৃশংসতার জন্যে? আমার মনে একটা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, আমার কাহিনিগুলোতে যে মনোরম জগত আমি সৃষ্টি করি, যা পড়ে আমার লেখার ভক্ত পাঠকেরা আমার পরের কাহিনির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে, সেই জগতের ঘটনাকে এই জগতের শৃঙ্খলায় খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না, আর কল্পনার সাবলীল প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। তখন থেকেই আমি লিখতে পারছিলাম না। আমার কল্পনায় জঞ্জাল জমতে শুরু করল। আমার কলমে শব্দগুলো যেন আঁকিবুকি ছাড়া আর কিছু নয়, এরকমটাই মনে হচ্ছিল। ৭৫ বছর বয়সে 'প্রয়াত' শব্দটি দেখেছিলাম আমার নামের আগে, কিন্তু তার আগেই কি লেখক হিসেবে আমার মৃত্যু হয়েছিল? তখন কি আমার মৃত্যুভয় হয়েছিল, যা আমি বুঝতে পারিনি? আমি কেন শিউরে উঠেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি। সেরকম একটা বীভৎস মৃত্যু আমি আমার জন্য চাইনি। আগের কোনো বোমা বিস্ফোরণেই আমিতো বিচলিত হইনি। কিন্তু এই বিস্ফোরণের ছবিটা এ ধরনের একটা বীভৎস মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা এনে দিয়েছিল মনে। আগের বিস্ফোরণগুলোর সাথে এই বিস্ফোরণটির পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য ছিল। কারণ ঘটনাটি আমাকে প্রত্যক্ষভাবে নাড়া দিয়েছিল, এই বিস্ফোরণ আমার ষাট বছরের জন্ম-জয়ন্তীতে ঘটেছিল। আর মৃতদেহটা আমি চিনতে পেরেছিলাম। দেহটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তবুও আমি ভাবছিলাম, মৃতদেহটি আমার প্রশ্ন করা সেই ছেলেটির না হয়ে আমারও হতে পারত। তাহলে আমার ষাট বছরের জন্ম-জয়ন্তীর দিনটাই হতো জীবনের শেষ দিন। আমাকে প্রশ্ন করা ছেলেটি আমার জন্ম-জয়ন্তীর সভা থেকে বেরিয়ে অপঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমার স্তাবকরা আমাকে ঘিরে না থাকলে আমিও বেরিয়ে যেতাম আর হয়তো আমিই ঘাতকের বলি হতাম। ঘটনাটি আমার জন্ম - জয়ন্তীর উৎসবস্থলের থেকে দূরে ঘটেনি। আমাকে প্রশ্ন করে বেরিয়ে যাওয়ার দেহটা দেখে চিনতে পেরেছিলাম। আমার কলম অচল হয়ে পড়েছিল তারপর থেকে বারে বারে ঘটনাটা মনে হতেই আমার চিত্তাকর্ষক কল্পনাগুলো বাধা পাচ্ছিল। আমি সশরীরে যে জগতে আছি আর যে সুন্দর, আকর্ষণীয় জগৎ আমি আমার কাহিনিতে সৃষ্টি করি, এই দুয়ের ভিতর কোনো সামঞ্জস্য আনতে না পেরে আমার কলম যে নির্বীর্য হয়ে পড়েছিল, হারিয়ে ফেলছিল সৃষ্টির ক্ষমতা। এই অক্ষমতা অসহায় ক্রোধে পরিণত হয়েছিল। ঘটনার বীভৎসতা আমার সৃষ্টি ক্ষমতাকে এমনভাবে দুর্বল করে দেয়ার জন্য আমার মনে ক্রোধের জন্ম হয়েছিল। কল্পনার মাকড়সাজাল থেকে বেরিয়ে এসে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছিলাম এই ধ্বংসযজ্ঞের সাথে জড়িত যারা তাদের। আমার স্তাবকরা বলছিল, আপনি কী করছেন? এত সুন্দর, সুখপাঠ্য, চিত্তাকর্ষক কাহিনিগুলো আপনি লিখছেন না কেন? আপনার সুন্দর ভাষায় এখন লেখা কথাগুলো খাপ খায়না। ওরা বুঝতে পারছে না, আমি গড়া গল্পের পৃথিবী আর গড়তে না পারার জন্য অসহায় হয়ে আমি দানবীয় দুষ্কর্মে লিপ্তদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছি। আমি যে কোনো গভীর বিশ্বাস থেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কলম তুলে নিয়েছিলাম আর তার ভিতর দিয়ে আমার কলমের হারিয়ে যাওয়া ক্ষমতা ফিরে পেয়েছিলাম, তা কিন্তু নয়। সেজন্যই আমার আস্ফালন কারো মনে রেখাপত করেনি। এসব লেখা দিয়ে গুণমুগথ একটা স্তাবকের দল সৃষ্টি করতে পারিনি আমি। আমি লেখা ছেড়ে দিলাম। আমার পঁচাত্তর বছর বয়সে একজন কেউ আমাকে সংবাদপত্রে মৃত বলে ঘোষণা করাতে আমি একটুও বিরক্ত বা বিচলিত হইনি। গোটা জগতের প্রতি আমি উদাসীন হয়ে গেলাম আর পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, সে খবরও রাখতাম না। হয়তো আমার মনই এ কৌশলটা গ্রহণ করেছিল। ফলস্বরূপ, আমি পেলাম উদ্বেগহীন একটা জীবন। আর নব্বই বছর বয়সে পূর্ণ জীবন ভোগ করে আমি এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। অমরত্বের প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেছে। আমি কাউকে চিনতে পারছি না। অন্যে আমার স্মৃতি চিহ্ন ধরে রাখার কী দরকার? এরকম একটা উদ্বেগহীন মৃত্যুই কি আমি চেয়েছিলাম?

কিন্তু সেই ছেলেটি যার মৃত্যু বিষয়ে করা প্রশ্নে হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছিল, এই মূহূর্তে সেই ছেলেটির কথা কেন বারবার মনে হচ্ছে? তার কথা প্রশ্নগুলো ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য কেন আমার মনে আসছে?

আমার বয়স এখন চৌষট্টি বছর। চৌষট্টি বছরের জন্মদিনে আমি আমার বারান্দায় বসে আমি। আমার পত্নী আমার কাছে। চার বছর আগের আমার ষাট বছরের জনমিদিনটির কথা মনে পড়ছে। সেই জন্মদিনটি সার্বিকভাবে পালিত হয়েছিল ধুমধাম করে। আমার গুণমুগ্ধরা কেউ এখন কাছে নেই। এই জন্মদিনটি অতিবাহিত হচ্ছে আমার পত্নীর সাথে। এই চার বছর আমি কোনো গল্প, উপন্যাস লিখতে পারিনি। লিখতে গেলেই বোমা - বিস্ফোরণে নিহত ছেলেটির ছিন্ন - ভিন্ন দেহটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর আমার সৃষ্টি করা কাহিনির পৃথিবীটা অলীক আর অদ্ভুত মনে হয়। আমি ক্ষোভ আর দুঃখের কাহিনি লেখার পরিবর্তে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ আর কঠোর ভাষায় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর সমালোচনা করেছি, নিন্দা করেছি আর তাদের তুলনা করেছি অসুর ও দানবের সাথে। আজ বারান্দায় বসে একটা সম্ভাব্য নব্বই বছরের মৃত্যুর দিনকে নিয়ে মনোরম কল্পনা করছি। কী নিরাবেগ, নিরুদ্বিগ্ন আর কাম্য মৃত্যু। হ্যাঁ, আমি চৌষট্টি বছরের এই জন্মদিনটিতে আমার মনের ভিতরে নব্বই বছরের মৃত্যুর দিনটিকে নিয়ে একটি কাল্পনিক কাহিনি সৃষ্টি করেছি। এই কাহিনিটি আমার আগেই চিত্তাকর্ষক সুখপাঠ্য কাহিনিগুলোর মতো নয়। এ কাহিনিটি আমার পাঠকের জন্য নয়। নিজের জন্যই। উদ্বেগের থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য একটা নিরুদ্বেগ কাল্পনিক মৃত্যুর কাহিনি আমি মনের ভিতরে রচনা করেছি।

বারান্দার চেয়ারে আমি আমার পত্নীর সাথে বসে আছি। আমি অনুমান করছি, সে আমার মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। অনেকক্ষণ আমার নীরব হয়ে আছি। অবশেষে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার মুখটা এত বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন? কিছু হয়েছে নাকি?

আমি মুখে বিছু বললাম না। আজকের চিঠির বাক্সে কারও ফেলে যাওয়া কাগজের টুকরোটা জামার বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করলাম। সেখানে শুধু একটি বাক্যই লেখা আছে। সেই বাক্যটা দিনে অনেকবার পড়ছি। তাতে কারো নাম নেই। দরকার নেই। যারা লিখেছে তারা জানে, আমি জানি। আমোঘ বিধান নিয়ে আমার জন্য একটা সংবাদ এসেছে, 'আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।' দুদিন আগে গল্প লেখার চেষ্টা করে নিষ্ফল হয়ে আমি উত্যক্ত হয়েছিলাম। জনসমক্ষে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো দরকার বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে যাদের বিরুদ্ধে আমি নিষ্ফলা বিবৃতি দিয়েছিলাম, তারাই আমার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

আমার মুখখানা নিশ্চয় ইতিমধ্যে মরা মানুষের মুখের মতো হয়েছে। পত্নী বিবর্ণ হয়েছে বলছে। আমি কাগজের টুকরোটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম।

একটুকরো সাদা কাগজ। ধবধবে সাদা। পত্নী বিস্মিত হয়ে কাগজের টুকরোটা দেখল। তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমি তার কথা ভুলে মৃত্যুদাতার জন্য অপেক্ষা করছি।